নব্বইয়ের কবিতা : দুই বাংলায়

সুজিত সরকার

বিশ শতকের প্রথম দশকটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন : 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি/বাজাও আপন সুর।/আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' –আর, শেষ দশকটিতে পিনাকী ঠাকুর লিখলেন : 'তাকাচ্ছে। হাস্যমুখ। সেভেন সি। লেডিজ সিট।/ডাকব না। খুব দেমাক। আচ্ছা বেশ। চাকরি পাই।' –এই দুটি উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে একশো বছরে কী বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে বাংলা কবিতায়– ভাষায়, ভাবনায়। ঠিকই যে একজন জীবনানন্দ কিংবা একজন শঙ্খ ঘোষ দশকের ছোট গণ্ডী অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত শতকের অন্তর্গত হয়ে যান, তবু কবিতার আলোচনায় দশক-বিভাজনরীতির গুরুত্ব পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না। কেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক', কেনই-বা রনজিৎ দাশ লিখেছিলেন 'সে কি ভূতগ্রস্থ? কেন পড়েছিল রক্তপুঁথি, কালোবাজরের দেশে/চেয়েছিল কৃষক বিপ্লব?' –তা, যথাযথভাবে বুঝে নিতে গেলে, ওই কবিরা যে যে দশকে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন সেই সেই দশক সম্পর্কে স্বচ্ছ একটি ধারণা থাকা জরুরি বলেই মনে করি। তাছাড়া, বাংলা কবিতা মানে তো শুধু পশ্চিমবঙ্গের কবিতা নয়, বাংলাদেশেরও কবিতা, আবার ত্রিপুরারও কবিতা, এমনকি শিলচর, বহিবঙ্গরও কবিতা। কমল চক্রবর্তী জামশেদপুরে থাকেন, প্রবুদ্ধসুন্দর কর থাকেন ত্রিপুরায়। এঁদের বাদ দিয়ে কি বাংলা কবিতার আলোচনা সম্ভব? বিশ শতকের শেষ দশকে পশ্চিমবাংলায় যেমন পিনাকী ঠাকুর কবি হিসেবে পরিচিত অর্জন করেছিলেন, তেমনই বাংলাদেশেও আর এক ঠাকুর অর্থাৎ টোকন ঠাকুর কবি হিসেবে সুপরিচিতি হয়ে ওঠেন। পিনাকী ঠাকুরের মতো তাঁর কবিতাতেও নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়: 'কবিতা আসে না/মাসে মাসে/গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির বিল আসে'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই কবি 'বিশ্বায়ন'কে বলেন 'বেশ্যায়ন'।

২.

পশ্চিমবঙ্গে 'নব্বইয়ের কবি' হিসেবে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাব্যগ্রন্থের নামগুলি থেকেই টের পাওয়া যায় এই দশকের বিশিষ্টতা। শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের নাম 'ইস্কুল অফিস ছাপাখানা', যশোধরা রায়চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থের নাম 'পণ্যসংহিতা', পৌলমী সেনগুপ্তের কাব্যগ্রন্থের নাম 'পেনসিলখুকি', পিনাকী ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের নাম 'অঙ্কে যত শূন্য পেলে', অংশুমান করের কাব্যগ্রন্থের নাম 'আপেল শহরের সম্রাট', বিভাস রায়চৌধুরীর কাবগ্রন্থের নাম 'শিমূলভাষা, পলাশভাষা', মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যগ্রন্থের নাম 'হৃদয় অবাধ্য মেয়ে'। 'ইস্কুল', 'অফিস', 'ছাপাখানা' আলাদা আলাদা তিনটি শব্দ, অথচ আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন এমন তিনটি শব্দকে পাশাপাশি স্থাপন করে শিবাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষার প্রতি তীব্র ও বিশুদ্ধ আবেগ থেকে রচিত হয়েছে বিভাস রায়চৌধুরীর অধিকাংশ কবিতা। এই কবি দেখেন 'বাঙালি ঘাস', 'বাংলা চাঁদ', 'বাংলা পাখি', লেখেন 'এত এত বাংলাদেশ'। তাই 'বাংলাভাষা' শব্দটি না লিখে এই কবি লেখেন 'শিমূলভাষা, পলাশভাষা'। 'মনুসংহিতা'র কথা অনেকেরই জানা, কিন্তু কবিতার বইয়ের নাম 'পণ্যসংহিতা' হতে পারে– এমন ধারণা কেউ কি কখনও আগে করতে পেরেছেন? অথচ যখন সংবাদপত্রে

সংবাদের চেয়ে বিবিধপণ্যের বর্ণময় বিজ্ঞাপনই তিন-চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে থাকে, টিভিতে খবর কিংবা খেলা কিংবা চলচ্চিত্রের ফাঁকেফাঁকে ঢুকে পড়ে বিবিধ পণ্যের বিজ্ঞাপন তখন কাব্যগ্রন্থের নাম যে 'পণ্যসংহিতা'ই হওয়া উচিত, যশোধরা রায়চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ যেন সেই সত্যকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। অংশুমান কর লেখেন :

ঈশ্বর ঘ্যান ঘ্যান করছেন
আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে তাঁর 'এটা দাও, ওটা দাও'
ঈশ্বর চুপ কর, ম্যানা খাও
আমার সময় কম

মন্দাক্রান্ত সেনের একটি কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন :

জিন্‌স্ পরা ছেড়ে দেওয়া যায়
সহজেই; নদী হতে পেলে ...
সাঁতার জানো তো তুমি, ছেলে?

এত সরাসরি কথা বলবার প্রবণতা আগের কোনো দশকেই লক্ষ্য করা যায়নি। আমি মনে করি, এই অতিস্পষ্টতাই নব্বইয়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি আরো দু'জন কবির কবিতার লাইন উদ্ধৃত করছি– এঁদের একজন শ্রীজাত ও অন্যজন বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়। এঁরা নব্বইয়ের শুরু থেকেই শুরু করেননি, কিন্তু কালক্রমে নব্বইয়ের কবি হিসেবে সর্বাধিক পরিচিতি অর্জন করেছেন। প্রথমে শ্রীজাতর কবিতার লাইন, কবিতার নাম 'রেনি-ডে' :

রোল নাম্বার ওয়ান? –রোল নাম্বার টু? –রোল নাম্বার থ্রি?–
রোল নাম্বার ফোর? –রোল নাম্বার ফাইভ?– রোল নাম্বার সিক্স?–

এইভাবে 'রোল নাম্বার থার্টি?' পর্যন্ত শেষ লাইনে প্রথম বন্ধনীর ভিতরে 'আজ নো স্টুডেন্ট ফাউণ্ড হল'। এবার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতার প্রথম স্তবক :

সরকার মায়ের মতন
তাই তার মারছি টাকা
ঘুরছে তুমুল স্পিডে
বিত্তসার চারটে চাকা...

৩.

ভাষা, ভঙ্গী ও ভাবনার এই পরিবর্তন শুধু পশ্চিমবঙ্গের কবিতাতেই নয়, পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশের কবিতাতেও। পশ্চিমবঙ্গের নব্বইয়ের কবিদের কাব্যগ্রন্থের মতো বাংলাদেশের নব্বইয়ের কবিদের কাব্যগ্রন্থের নামগুলিও অভিনব। সরকার আমিনের কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্লেড দিয়ে কেটেছিলে জল' বায়তুল্লাহ্ কাদেরীর কাব্যগ্রন্থের নাম 'দুঃখের আঙুল নড়েচড়ে', চঞ্চল আশরাফের কাব্যগ্রন্থ 'অসমাপ্ত শিরদাঁড়া', কুমার চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্র বিষণ্নতা ও অলীক বাতিঘর', টোকন ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ 'দূরসম্পর্কের মেঘ', আশরাফ রোকনের কাব্যগ্রন্থ 'দরজি ভোর', রহমান হেনরীর 'বনভোজনের মতো অন্ধকার', মারজুক রাসেলের 'শান্টিং ছাড়া সংযোগ নিষিদ্ধ', শামীমুল হক শামীমের 'তপোবনে তোপধ্বনি', পাবলো শাহির 'শব্দ বিশারদগণ কহেন

উহা পেণ্ডুলাম শরীরের গোলাকার মহাপ্রাণধ্বনি'। রহমান হেনরীর 'স্মৃতিসম্মেলন' কবিতাটির কয়েকটি লাইন :

তোমাকে দেখতে যাবো সাধু যোসেফের সমাবেশে
উনিশ শ' একাশি খ্রিস্টাব্দের সোনালি উৎসবে;
তখন আমার দুঃখ মাধ্যমিক, আর তুমি নিম্নমাধ্যমিকে...
এরকম উৎসব পুনরায় স্মৃতিতে সম্ভব। তোমাকে দেখতে
যাবো অনুতপ্ত স্মৃতিসম্মেলনে।

সাধু যোশেফের কথা এলো কেন? কেন উনিশশ' একাশি? দুঃখ 'মাধ্যমিক' কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমরা যেখানে পৌছবো সেখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যাবে নতুন কাব্যভাষা নির্মাণের বিশেষ কৌশলগুলিকে। দু-হাজার চারে রচিত হয়েছে এই কবিতা। কবিতার নাম যেহেতু স্মৃতিসম্মেলন' কবি ফিরে যাচ্ছেন তেইশ বছর আগে অর্থাৎ উনিশশ' একাশিতে, যখন তিনি সাধু যোশেফ হাইস্কুলের মাধ্যমিকের ছাত্র। সেইসময় নিম্নমাধ্যমিকে পড়া এক বালিকা তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সেই বালিকা ও কবির মধ্যে কোনো সম্পর্কের সেতু গড়ে ওঠেনি। আর তাই, স্মৃতির সরণি দিয়ে কবি ফিরে যেতে চাইছেন সেই বালিকার কাছে। এটুকু জানার পরে, পাঠক, আপনি লাইনগুলি আবার পড়ুন এবং এবারে আপনি স্পষ্ট টের পেয়ে যাবেন নতুন কাব্য ভাষা নির্মাণের পদ্ধতি। সরকার আমিন তো কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা যথেষ্ট অভিনব : 'কবি মৃত মানুষের চোখে কথাকে শুয়ে থাকতে দেখেন। উনুনে চড়ার মুহূর্তেও মাছ লেজ নাড়ায়। এসব কথা জানেন কবি। যে শব্দ, বাক্য কবির পাগলপ্রায় অনুভবগুচ্ছকে ধৃত করে তাই তো কবিতা। কবিতা অস্বাভাবিক শব্দের সমিতি।' এই কবি মনে করেন : 'অক্ষরবৃত্ত, মাত্রা বা স্বরবৃত্ত সবকটি ছন্দই মৌলবাদে রূপ নিয়েছে।' দৃঢ়কণ্ঠেই তিনি জানিয়ে দেন : 'আমি ছন্দ লিখতে চাই না; কবিতা লিখতে চাই।' কেমন কবিতা লেখেন সরকার আমিন? শুনুন, তাঁর ছোট কিন্তু সম্পূর্ণ একটি কবিতা :

বেরিয়ে আসো বাবা আমিন
আয়নার ভেতর থেকে
প্রতিবিম্বের জামা-কাপড় খুলে
মিশে যাও দৈহিক মিলনে।

আয়নার ভেতরের আমিন
আয়নার বাইরের আমিন
হ্যান্ডশেক করো

দুষ্ট শিশুরা আয়না ভেঙে টুকরো টুকরো করার আগে
বাবা বেরিয়ে আসো আমিন।

পাঠক, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন, এরকম বাংলা কবিতা আপনি আগে কখনো পড়েননি। আপনি যদি সত্যিকারের কবিতাপ্রেমিক হন তবে এমন পরিবর্তনে আপনি ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন, কারণ পরিবর্তনশীলতাই জীবনের ধর্ম, পরিবর্তনশীলতাই একটি জাতির কিংবা সভ্যতার অগ্রগতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আসুন, আরো কিছু নতুন উচ্চারণ আপনাকে শোনাই :

ক.

মফস্বলে রচিত কবিতা তুমি অতি মনোযোগে
বিদ্যুতের নিচে বসে ছাপা করো–
আর সেই ছাপাযন্ত্রের রোলারের ছাপে
চ্যাপ্টা হয়ে বেরিয়ে আসছে
কবির অস্বচ্ছ মুখ,
. হস্তলিপি, বাঁকাচোরা হাসি।

কামরুজ্জামান কামু

খ.

আজও পাহাড় দেখার তীব্র বাসনার কথা মনে হলে
চুপিচুপি তোমাদের গ্রামে যাই। আজ হাটবার...
প্রচ ভিড় ঠেলে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ুতে থাকি-
বড় রাস্তা থেকে আলপথ
আলপথ থেকে ক্ষেতের কোনাকুনি...

শস্য কাটা হয়ে গেলে পড়ে থাকে হাহাকার

শামীমুল হক শামীম

গ.

গোধূলি সরিয়ে
সমুদ্র সরিয়ে
বিয়ারের ফেনা থেকে উঁকি দিল
পৃথিবীর বিখ্যাত যৌন অপরাধগুলি

চঞ্চল আশরাফ

ঘ.

স্তন। এই নারীবাক্য অধিক বিশেষ্য। মহাপ্রাণধ্বনিতে নির্মিত মাত্রা-জ্ঞান-শূন্য গোলক। অদৃশ্য বলয়যুক্ত যাদুঘর। ক্রমস্ফীতি। মেটাফিজিক্স। গোলক, যা বর্তুল-প্রাণময়। এই স্তন ধর্মসংক্রান্ত।

ব্রাত্য রাইসু

ঙ.

রূপচাঁদা মাছের সাঁতার থমকে আছে খাবার টেবিলে, ...
.....
.....
আমরা কতিপয় রূপচাঁদা শুকনো
সমুদ্রে এখনো সাঁতরাই স্বপ্নবুনি-স্বপ্নখাই! হয়তো কেউ গৃহপালিত
বনসাই হবো কোন একদিন, কিংবা
তাদের খাবার টেবিলে থমকে যাবে আমাদের স্বপ্ন সাঁতার

শামীম রেজা

চ.

পোলকা ডটের মতো চোখ তুলে আকাশের দিকে বলে ইরাবতী, জলের
গল্প কেবল তখনই ভালো লাগে, শুষ্ক মৌসুমে, খেলানো উচ্ছ্বাসগুলো
পলকে মিলিয়ে গেলে দূর সমুদ্রপাড়ায়, তবু ফেনাময় ঢেউয়ের রেখা যদি
মূর্ত হয়ে ওঠে কোনোখানে, ভেসে যেতে পারব না আমি ললিত প্যাশনে
একই ভেলায় চড়ে তুরীয়ানন্দের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু অনিবার্য
বিভূতি বোধনে

মুজিব মেহদী

৪.

নব্বইয়ের তিনজন কবির নতুন কাব্যগ্রন্থ নিয়ে একবার আলোচনা করেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। আলোচনাটির নাম দিয়েছিলাম 'অতিস্পষ্টতার দিকে'। পশ্চিমবঙ্গে নব্বইয়ের কবিদের কবিতা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায় যে এই কবিতা বড়ো বেশি ঝকঝকে, সরাসরি। যে রহস্যময়তার কারণে একটি কবিতা 'কবিতা' হয়ে ওঠে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত এই কবিতায়। তবু কারো কারো কবিতার সম্পর্কে 'অতিস্পষ্ট' বিশেষণটি ব্যবহার করা বোধ হয় সমীচীন হবে না। যেমন, অনির্বাণ দাসের কবিতা :

অনেকটা ঝিঁঝি পোকার মতো

দেখা যায় না
ডাক শোনা যায়

এই কবিতাটির নাম 'মন'। কবিতাটির দিকে আমি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকি। এই কবিতা ভেবেচিন্তে লেখা যায় না, ভিতর থেকে সহসাই উঠে আসে। যশোধরা রায়চৌধুরীর 'ভীষ্ম' একটি অসাধারণ কবিতা। কবিতাটি আমার ভীষণ প্রিয়। পুরাণকে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করা যদি কবির অন্যতম প্রধান কাজ হয়, তাহলে বলবো, যশোধরা রায়চৌধুরীর কবিতাটি তার একটি সার্থক উদাহরণ। সম্পূর্ণ কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করছি :

সেই ভদ্রলোক সব বুঝতে পারতেন কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না
সেই ভদ্রলোক মোটা চশমার, সারাদিন স্টেটসম্যান পড়তেন
আর চিঠি লিখতেন স্টেটসম্যানকে : হে সম্পাদক
আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার এত বেশি কেন?

গিন্নি সংসার চালাতে হিমসিম, মেয়ে দুটি বড়ো হয়ে উঠল
ভদ্রলোক সবকিছু বুঝতে পারতেন কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না
রোগা, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি, চিঠি লিখছেন, হে সম্পাদক
মেয়েদের এই অবস্থা কেন এ পোড়া দেশে

মেয়েদের বিয়ের গয়নাগাটি আসবাব
দিতে গিয়ে গ্র্যাচুইটি শেষ। গিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
উল বুনতেন, বিক্রি করতেন আচার আর বড়ি
সেই ভদ্রলোক সব বুঝতেন কিন্তু কিচ্ছু করার ছিল না
নাতিদের ইংরেজি ইশকুলে দিয়ে
জামাই দুটো যখন পয়সা রোজগার করতে খাবি খাচ্ছে

মেয়েদের হাতে একটু বেশি তুলে দিতে
গিন্নির পায়ে হাজা, চোখে ছানি, গলা, হাত ফাঁকা

জিরজিরে বুক, ঢলঢলে ফতুয়া
ভদ্রলোক তখনো.... হে সম্পাদক
জলে যেন আর্সেনিক, তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় কেন এত ত্রুটি
আমাদের মূল্যস্ফীতি কেন এত ভয়াবহ...

৫.

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একটি দশকে যত কবি আবির্ভূত হন, তাঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত এক চতুর্থাংশ টিকে থাকেন, বাকিরা কবিতা থেকে দূরে সরে যান, অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিরিশের কবি বললে এখন বড়ো জোর দশজনের কথাই আমাদের মনে পড়ে। পঞ্চাশের কবি বললে এখন পনেরো জনের বেশি নাম আমরা যারা কবিতা লিখি, তারাই বলতে পারবো না। সত্তরের কবিদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে তিন-চারটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সংকলনটিতে ছিলেন একশো নয়জন কবি। দ্বিতীয়টিতে সেটি কমে গিয়ে তেষট্টিতে দাঁড়ালো। পরের দুটিতে আরো কমে গেছে। তাছাড়া, সঠিক বিচারে তিরিশের কবি জীবনানন্দ কবি হিসেবে প্রথম শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন পঞ্চাশের কবিদের কাছে। সত্তরের জয় গোস্বামী নব্বইয়ের কবিদের কাছে। সুতরাং, নব্বইয়ের কতজন কবি শেষ পর্যন্ত থাকবেন, কতজনই বা পরবর্তীকালে কবিদের কাছে সমাদৃত হবেন তা দেখার জন্য দুহাজার কুড়ি পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। এই লেখাটি সম্ভবত তারই অসম্পূর্ণ সূচনা।